বাংলাদেশের সংকট : প্রসঙ্গ অমীমাংসিত সেকুলারিজম

আবদুল বাছির*

সারসংক্ষেপ : দক্ষিণ এশিয়ার বাস্তবতা এটাই যে, এখানে ধর্ম ও রাজনীতি উভয়ই সমাজজীবনের পরস্পর ক্রিয়ার উপাদানবিশেষ। অন্যান্য সামাজিক উপাদানের ক্ষেত্রে বিশেষত নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মীয় পরিচয় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান বিশ্বে উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলো সেকুলারিজমকে (রশীদ, ১৯৮২ : ১৬) মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রকৃত অর্থে রাজনীতিকে ধর্ম ও অন্যান্য সংকীর্ণ চেতনার প্রভাবমুক্ত করা অধুনা রাজনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের অন্যতম প্রধান দিক হচ্ছে বিভিন্ন সংকীর্ণ কৃষ্টির বিপরীতে সেকুলার বা লোকায়াত কৃষ্টি নির্ভরতা। দক্ষিণ এশিয়ার কৃষ্টিবিন্যাসে ধর্ম এমনভাবে যুক্ত যে, সামাজিক কাঠামোর যে কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় ফলাফল বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়। বাংলাদেশ বর্তমানে এর অন্যতম উদাহরণ। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কী ধরনের অবয়বে পরিবর্তিত হয়েছিল তা পর্যালোচনার দাবি রাখে। বর্তমানে প্রবন্ধে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়ন বারবার কেন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তা আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

১৯৪৭ সালের পূর্বে অবিভক্ত ভারতবর্ষে মুসলিম লীগ মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ইস্যুকে গণমুখী করার মিছিলে সকলকে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু আলেম সম্প্রদায় এবং গোঁড়া ইসলামপন্থিদের তেমন কোনো সমর্থন এতে ছিল না। কেননা মুসলিম লীগের নিকট ইসলাম ধর্ম ছিল রাজনৈতিক সুবিধা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার। এটা বুঝতে পেরে মোল্লাশ্রেণি মুসলিম লীগের বিপরীতে 'জামায়াতে উলামায়ে হিন্দ' এবং 'জামায়াত-ই- ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা যথার্থ-ই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ইসলামি বিপ্লব সম্ভব নয়। কেননা মুসলিম লীগের সদস্যরা ছিলেন সামন্তবাদী এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের চেয়ে হিন্দু প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্র গঠন করা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাস্তব ভিত্তিক কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার যথোপযুক্ত সুরাহা না করেই বা সমাজ কাঠামোতে বিদ্যমান দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু মীমাংসা না করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। এ রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র তৈরীতে দুটো বড় সংকট লক্ষণীয় ছিল — প্রথমটি ছিল ইসলাম ধর্ম এবং দ্বিতীয়টি ছিল, অঞ্চলভিত্তিক চেতনা। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে গভর্নর জেনারেল

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) বলেন — "you are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed… that has nothing to do with the business of the state" (হুমায়ুন, ২০১৯ : ৮১)। কিন্তু পরে এ আদর্শে স্থির থাকতে না পেরে তিনিই এক বছর পর বললেন ; 'পাকিস্তানে শরীয়ত-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না' (Leonard, 1963 : 100)। এ থেকে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ অনুধাবন করা যায়। এতে গোঁড়াপন্থি আলেমগণ খুশি হতে পারেননি। কেননা বাস্তবতা সম্পর্কে তারা ছিলেন সচেতন। পাকিস্তানের বড় দুটো সমস্যা ছিল : একটি ধর্মীয় পরিচয়, অন্যটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ। এ দুটো ধারা মুসলিম লীগের অনুসৃত আদর্শের বিপরীত ছিল — অন্যদিকে এ দু' ধারার মধ্যে ছিল পারস্পরিক দ্বন্দ্ব।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর তাদের নানামুখী নীতি, বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষি ভদ্রলোক সম্প্রদায় অনুধাবন করতে থাকেন যে, ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধ প্রকৃত পক্ষে তাদের বিকাশের অনুকূলে নয়। এ পর্বে পিছনে ফিরে তারা ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন দাবি করতে থাকেন, যাতে অঞ্চলভিত্তিক চেতনাগুলোকে স্বীকার করে নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। অন্য দিকে মুসলিম লীগের জাতীয় সংহতির নীতিও ব্যর্থ হয় এবং পূর্ব বাংলার ভাষার মর্যাদাসহ নানান দাবি উপেক্ষা করা হয়। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগ 'মুসলিম' শব্দটি পরিহার করে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করে। ফলে ভাষা-ভিত্তিক জাতীয় চেতনা অর্থাৎ ' বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা উজ্জীবিত হতে থাকে। বাঙালির এরূপ চেতনা যেমন পাকিস্তানের শাসক শ্রেণির স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল অন্যদিকে এ চেতনার সেকুলার চরিত্রের জন্য গোঁড়া আলেম সম্প্রদায়ের মনোভাবেরও বিরোধী ছিল। কেননা আলম সম্প্রদায় মনে করেন, জাতীয়তাবাদের একমাত্র উৎস হলো ইসলাম ধর্ম (Rounaq, 1980 : 101)। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে আলেম সম্প্রদায়, মুসলিম লীগ ও এলিটদের মধ্যে সখ্য কি তৈরী হবে না? অবশ্যই হবে এবং হলোও। কারণ, এখানে সকলের স্বার্থ ছিল অভিন্ন। এক্ষেত্রে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে। এই সংঘাতের চূড়ান্ত পর্যায় হলো, ১৯৭১ সালের বাঙালির মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ। এ যুদ্ধের সাফল্য হলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির ধর্মীয় চেতনার নামে বাঙালির ওপর বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার নির্যাতনই মূলত বাংলায় সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করেছিল। বাংলাভাষি নেতৃত্ব তথা অগ্রসর শ্রেণি নিজেদের বিকাশকে সুনিশ্চিত করার জন্য সেকুলার মতাদর্শ গ্রহণ করেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, এই মতাদর্শের সামাজিকীকরণ কি হয়েছিল? আমাদের সমাজে দীর্ঘ দিন যাবৎ কি এর চর্চা আমরা করতে পেরেছি? এটি কি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এনেছিল? কিন্তু আমাদের দীর্ঘদিনের ইতিহাস ধারণা দেয় যে, এ বিষয়ের চর্চা বেশি দিন ধরে হয়নি। এমতাবস্থায় আমাদের কাছে সেকুলারিজম ছিল একটি

উপশম। এটি লক্ষ্য হয়ে ওঠতে পারেনি সকলের নিকট। অন্যদিকে ইউরোপে রেনেসাঁস থেকে প্রাপ্ত সেকুলারিজম নিজে ছিল লক্ষ্য, যার সাথে সামগ্রিক সামাজিক চেতনা যুক্ত ছিল। বাংলাদেশে সেকুলারিজম উন্মেষের মূলে যে চেতনা ছিল তার পশ্চাতে ছিল পাকিস্তানি ধর্মীয় মতাদর্শের বিপরীতে একটি পাল্টা মতাদর্শ, যা না ছিল স্বপ্রণোদিত, না ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সেই সাথে এখানে গণমানুষের পর্যায়ে সামাজিক চেতনার অভাব ছিল (রশীদ, ১৯৮২ : ১৭) এ কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে মতাদর্শ হিসেবে সেকুলারিজম রাষ্ট্রীয় মূলনীতির (সংবিধানের চারটি মূল নীতির একটি ছিল সেকুলারিজম) অন্তর্ভুক্ত হলেও গণমনে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে গেল। তাই বাংলাদেশে প্রণীত তৎকালীন সেকুলারিজমকে ইউরোপের ন্যায় ভাবা যাবে না।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব বাংলায় জনমনে কতিপয় মতাদর্শ তৈরি হতে থাকে। পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রাম বাঙালিকে মতাদর্শী করে তোলে। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হল। বাংলাদেশের জনগণ যে সমস্ত মূলনীতির প্রশ্নে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল সংবিধানের প্রস্তাবনায় সেগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই আদর্শগুলো হলো গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও সেকুলারিজম। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সেকুলারিজমকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের প্রেক্ষাপট ছিলো পাকিস্তানের ইসলামি রাষ্ট্রগঠনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে জনগণের দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। শেখ মুজিবুর রহমান সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সেকুলরিজম সম্পর্কে দৃঢ় মত ব্যক্ত করে বলা হয় —

> The 1972 constitution not only declared secularism as one of the fundamental principles of the state policy but also prescribed certain measures for its implementation. These included elimination of communalism in all its forms; no political recognition of any religion by the state; no use of religion for political purpose; and no discrimination or persecution on religious grounds. (Bangladesh Constitution Article-12)

সংবিধানে বর্ণিত এই মূলনীতিটি ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও দৃঢ় পদক্ষেপ এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমধিক প্রগতিশীল ও আদর্শিক। অনেকে মেনে নিতে পারেন নি। মাওলানা ভাসানী সংবিধানের চার মূলনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে দাবি তোলেন, বাংলাদেশের সংবিধান অবশ্যই পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও হাদিসকে ভিত্তি করে রচনা করতে হবে — (The Morning News, Dhaka : 8 October 1972)

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অংশ হিসেবে সেকুলারিজম সম্পর্কে এরূপ নীতি গ্রহণ করা হয় যে, সরকারি কোনো ক্ষেত্রেই ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করা যাবে না। জাতীয় গণমাধ্যমে এবং বক্তৃতায় 'জয় বাংলা' স্লোগান ব্যবহার করা হয়। এতে বাংলার

মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হয়। স্বাধীনতার পর পর এখানে ভারত বিরোধিতা প্রকট হয়। সেকুলারিজম বলতে সাধারণ মানুষ বুঝতে থাকে ধর্মহীনতা। (রশীদ, ১৯৮২ : ১৮) আর সরকারি নীতিতে 'ধর্ম' প্রতীক হিসেবে ব্যবহার না হওয়াকে মুসলিম বিরোধী কর্মকাণ্ড বলে অপপ্রচার চালানো হয়। বিপরীতে সেকুলারিজম হিন্দুপন্থি মতাদর্শ হিসেবে অনেকের কাছে বিবেচিত হতে থাকে। ফলে সেকুলারিজম মতাদর্শ হিসেবে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। চাপের মুখে মুজিব সরকার ভারতের অনুকরণে সকল ধর্মের প্রতি সরকারি সুযোগের সমতার নীতি গ্রহণ করেন এবং এভাবে সেকুলারিজমকে নির্দিষ্ট করতে শুরু করেন। সেকুলারিজম সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেন যে,

> Secularism does not mean the absence of religion. The 75 million people of Bengal will have the right to religion. We do not want to ban religion by law … Muslims will observe their religion … Hindus will observe their religion ... Buddhist and Christians will observe their respective religion … our only objection is that nobody will be allowed to use religion as a political weapon. (Talukder, 1985 : 44)

কিন্তু বাঙালিদের আচরণে দেখা যায় যে, সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতি একটি নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে, যা সরকারের প্রতি অনাস্থার নামান্তর (Rounaq, 1995 : 13)। এমতাবস্থায় মুজিব সরকার গণদাবির প্রতি নত হন এবং ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মের প্রতীক ব্যবহার করতে শুরু করেন। তা ছাড়া অর্থনৈতিক কারণেও ধর্মের সাথে সরকারের আপস-রফা গৃহীত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে মুজিব সরকার তাঁর মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে নমনীয়তা দেখান এবং রাষ্ট্রের ইসলামি ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণে প্রয়াসী হন। বলা যায়, এখানে সেকুলারিজমের সাথে ইসলামি পরিচয়ের আপস-রফা করতে তিনি বাধ্য হন।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আওয়ামী লীগ সরকার শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার শুরু করেন (রশীদ, ২০)। রাষ্ট্রীয় নীতিতে সেকুলারিজম জনগণের নিকট প্রশ্নাতীত ছিল না। এমতাবস্থায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কলঙ্কিত ও বর্বরতামূলক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এতে দেশে সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ট নস্যাৎ হয়। ক্ষমতায় বসেন মোশতাক সরকার। তারা ধর্মীয়করণের ক্ষেত্রে দেশকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়। সেই সময় রেডিওতে ইসলামি সংগীতের প্রাবল্য দেখলে মোশতাক সরকারের মতাদর্শিক চরিত্র বুঝা যায়। 'জয় বাংলার' স্থলে উর্দু রীতির অনুকরণে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ব্যবহৃত হয় (Harun, 2012 : 31)। শাসকবর্গ ইসলামি পোষাক পরিধানসহ বেশিসংখ্যক মুসলিমকে হজ্জে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। প্রেসিডেন্ট মোশতাক পাকিস্তান ও চীনের সাথে সখ্য গড়ে তোলেন। সৌদি আরব ও চীন এ সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। অন্যদিকে সেকুলার মনোভাবাপন্ন আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের কারাগারে নেওয়া হয়। মতাদর্শের দিক থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর

রহমানও অনুরূপ নীতিই গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালের গণভোটের পূর্বে জিয়াউর রহমান এক অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করেন। সংবিধানের ৩৮ নং ধারা (Bangladesh Constitution Article : 38) বাতিল এবং দালাল আইন গ্রহণ করার ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা বিরোধী ইসলামপন্থি দলগুলো পুনরায় রাজনৈতিক ঠিকানা ফিরে পায়, যাতে সেকুলারিজম চূড়ান্তভাবে সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে তৎপরিবর্তে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর চূড়ান্ত আস্থা' সংযুক্ত হয়। এই নীতি বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিকের চরিত্রে আবৃত করে ফেলে। ইসলামপন্থিদের সমর্থন পাবার জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়া 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানের রাহিম' বলে বক্তৃতা আরম্ভ করতেন এবং 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলে বক্তৃতা শেষ করতেন (Sajjadur, 2010 : 83)। সেই সাথে তিনি 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদের স্থলে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদ প্রতিস্থাপন করেন, যা বর্তমানেও বহাল আছে। ইসলামীকরণের অনুকূলে আরো কিছু পদক্ষেপ জিয়া সরকার গ্রহণ করেন, যেমন- দুই ঈদের আগে ও পরে প্রধান প্রধান সড়কের শোভা বর্ধন, ঈদ মোবারক ফেস্টুন ঝুলানো, কালেমা বা কুরআনের আয়াত উৎকীর্ণকরণ, ঈদের দিনে নাগরিকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়; এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ও বেতারে দিনে পাঁচবার আযান প্রচার করা, পৃথক ধর্মীয় মন্ত্রণালয় স্থাপন এবং ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। জিয়ার ইসলামিকরণ নীতি মুসলিম দেশসমূহে প্রশংসিত হয়। (Harun, 2012 : 33) বাংলাদেশ এ সময়ে OIC-এর প্রভাবশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জিয়াউর রহমানের এরূপ নীতির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল–

(ক) আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি নষ্ট করা।
(খ) ডানপন্থিদের (ইসলামপন্থি) সমর্থন আদায় এবং রাজনৈতিক মঞ্চে তাদের আগমনের পথ করে দেয়া।
(গ) আওয়ামী লীগের পাল্টা শক্তি প্রতিষ্ঠা করা।
(ঘ) ভারত বিরোধী চেতনাকে শানিত করা;
(ঙ) অধিক সাহায্য পেতে মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য ইসলামিক দেশের আস্থাভাজন হওয়ার অনুকূলে কাজ করা।
(চ) ইসলামি মতাদর্শের রাষ্ট্রীয় প্রতিফলন। এ নীতিতে জিয়া সরকার বেশ সফলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। (রশীদ, ১৯৮২ : ২০)

১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দলবিধি ঘোষণা এবং ঘরোয়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বীকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের মতো আলেম সম্প্রদায়ও তাদের স্ব স্ব প্রাক্তন রাজনৈতিক ঠিকানা পুনর্জাগরণের জন্য সচেষ্ট হয়ে পড়েন। তাদের লক্ষ্য ছিল পরিপূর্ণ ইসলামিক রাষ্ট্র ও জীবনব্যবস্থা কায়েম করা। এ দিক থেকে 'জামায়াত -ই ইসলামী' অনেকাংশে এগিয়ে ছিল। তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলামি নীতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের দাবি তোলেন। আবার অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইসলামি দলও এ সময়ে আত্মপ্রকাশ করে, যা ছিল

ইসলামপন্থিদের অনৈক্যের নির্দেশক। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর মোশতাক, সায়েম ও জিয়া সরকারকে সমর্থন দেবার ব্যাপারে ইসলামপন্থি দলগুলোর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে ইসলামি নীতি গ্রহণই এর অন্যতম কারণ। কিন্তু কেন এমন হল? এর উত্তর অনুসন্ধানে বলা যায় যে —

ক) সমাজ কাঠামো ও রাজনীতিতে আধুনিকতার সংকট ছিল।
খ) সুপ্ত এবং জাগ্রত সামাজিক চেতনা ও কৃষ্টি।
গ) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ও তার চাপ।
ঘ) শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানহীনতা।
ঙ) সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য।
চ) বার বার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন — বাংলাদেশ সমাজ কাঠামো তখনো আধুনিক রাজনৈতিক কাঠামো ও কার্যের ভার বহনে সক্ষম ছিল না (রশীদ, ১৯৮২ : ২১)। এর অর্থ হলো, রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ ও সামাজিক আধুনিকীকরনের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা।

মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বা মুক্তিযুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বা সমর্থন ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না। এ কারণে সামাজিক পর্যায়ে ধর্মীয় অবস্থান পূর্বের মতোই অটুট থেকে যায়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার এই সামাজিক সত্যকে বুঝতে না পেরে ট্রাডিশনাল সমাজের উপর অত্যাধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুষঙ্গ সেকুলারিজমকে প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন করেন। যার ফলে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং ধর্মীয় রাজনীতির সাথে জড়িত গোষ্ঠী জনগণকে ভুল বুঝাবার সুযোগ পায় (Rounaq, 1980 : 101)। সেকুলারিজম প্রশ্নে আওয়ামী লীগ বিরোধী চেতনা দানা বাঁধে এবং নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে অনুপ্রেরণা যোগায়। বলা বাহুল্য, উপর্যুক্ত অবস্থার সাথে বঙ্গবন্ধু সরকারের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কতিপয় সীমাবদ্ধতা ধর্মীয় রাজনীতির পুনর্জাগরণকে ত্বরান্বিত করে তোলে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতির পুনর্জাগরণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ বিশেষ করে সৌদি আরব আর্থিক সাহায্যের নামে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বঙ্গবন্ধু নিজেই এরূপ পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে বাধ্য হন। মধ্যপ্রাচ্যের আর্থিক সাহায্য ইসলামি ভাবাদর্শ আনয়নের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ইসলামি শক্তিসমূহ এ থেকে লাভবান হয় আর মজবুত করে তাদের অবস্থান (Ali, 2008 : 9)। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পঁচাত্তর-পরবর্তী সরকারগুলো রাজনৈতিক স্বার্থে সামাজিক শক্তিগুলোকে বিভিন্ন কায়দায় ব্যবহারের ফলে সংহতির স্থলে প্রাধান্য পেয়েছে বিভেদ। আর এলিট শ্রেণির ক্ষমতার কোন্দল ধর্ম ও রাজনীতির প্রশ্নে জটিলতার সৃষ্টি করেছিল।

প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করে জেনারেল এরশাদ ২৪ মার্চ ১৯৮২ তারিখে ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রনীতিতে জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিভিন্ন মাজার, মসজিদ এবং পীরের দরগাহ-য় ভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন অনুদান প্রদান করেন।

ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রচুর অর্থ বরাদ্দ দেন। পূর্বের ন্যায় ইসলামি বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। যাকাত তহবিল গঠন করে নিজেই এর প্রধান হন। ১৯৮৮ সালের ৭ জুন তিনি ইসলাম'কে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন (Harun, 2012 : 34)। এই বিধানটি মালয়েশিয়ার সংবিধান হতে নেয়া হয়ে থাকতে পারে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এদেশে নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ' গঠিত হয়। জিয়া ও এরশাদ সরকারের নিকট ইসলাম ধর্ম ছিল রাজনৈতিক ব্যবহারের প্রয়োজনের মধ্যে সীমিত।

১৯৯০ সালে গণআন্দোলনে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। ১৯৯১ সালে সাধারণ নির্বাচনে বেগম জিয়ার বিএনপি দল 'জামায়াত-ই ইসলামী'র সমর্থনে ক্ষমতায় আসে। নিবার্চনে তাদের স্লোগান ছিল 'লা ইলাহা ইল্লালাহ্ ধানের শীষে বিসমিল্লাহ।' এতে তারা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তারা ইসলামপন্থি একটি দল। এ স্লোগানের মাধ্যমে তারা ভোটারদের আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। বুঝাই যাচ্ছে জিয়াউর রহমানের ধর্মীয় আদর্শে তারাও বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য ১৯৯৬ সালের নিবার্চনে সেকুলারপন্থিরা জয়ী হয়। তখন 'জামায়াত-ই ইসলামী' দল ক্ষমতার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। এ সময়ে আফগান যুদ্ধ শেষে অনেক যোদ্ধা দেশে ফিরে আসে। এরাই দেশে ইসলামি উগ্রপন্থার সূচনা করে এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দেখা দেয়। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটানো হয় (Ali, 2008 : 9)। নানা রকম ইসলামি ও ধর্মীয় দল তৈরি হয়। এর মধ্যে আহলে হাদিস অন্যতম। সেকুলারপন্থিদের ফতোয়ার মাধ্যমে কখনো মুরতাদ কখনো ইসলামবিরোধী বলে চিহ্নিত করা হয়। ইসলামি উগ্রপন্থিরা দেশের নানা জায়গায় বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালায়, এমন কি শেখ হাসিনার জীবনও বিপন্ন হবার উপক্রম হয়। শেখ হাসিনা নিজে ইসলামি আকিদা মেনে চলার চেষ্টা করেন (Harun, 2012 : 35)। তিনি একাধিকবার সৌদি আরবে হজ্জ পালনের জন্য যান।

২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে বিএনপি-জামায়াত। জামায়াত নেতা নিজামী ও মুজাহিদকে মন্ত্রিত্ব দেয়া হয়। মনে করিয়ে দিতে চাই, তারা ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীদের অন্যতম (বর্তমানে তাদের দু'জনকে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে)। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই সময় একটি যুগসন্ধিক্ষণ। নির্বাচন-উত্তর সহিংসতায় সংখ্যালঘু শ্রেণির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। অনেককে পুড়িয়ে মারা হয়। অনেকে দেশত্যাগে বাধ্য হন। সময়টি আমাদের পাকিস্তান আমলের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সময়ের অন্যতম ঘটনা হলো, ধর্মীয় (ইসলাম) উগ্রপন্থার প্রসার। তখন আলোচিত বিষয় ছিল জামায়াতুল মোজাহেদীন বাংলাদেশ (JMB), জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (JMJB), হরকাত উল জিহাদ ইসলামি (HUJI) এবং তাদের উগ্র ও বর্বর কর্মকাণ্ড। এর সাথে যুক্ত হয় হিজবুত তাহরির (HT) নামে একটি ভয়ানক সংগঠন। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট

পল্টনে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। এতে ২৪ জন লোকের মৃত্যু হয়। ২০০৫ সালের ২১ আগস্ট বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬৩টিতে এক সঙ্গে ৪৫০টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে দশ ট্রাক অস্ত্র ধরা পড়ে। তদন্তে জানা যায়, এ অস্ত্র পূর্ব ভারতের গেরিলা গোষ্ঠী উলফা (ULFA) কে সাহায্য করার জন্য সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে পাঠানো হচ্ছিল। ২০০৭-২০০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক জেএমবি-এর কয়েকজন প্রধান নেতাকে তাদের জঘন্য কর্মের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। এসবই ছিল সেকুলারিজমের উপর ভয়ানক আঘাত।

২০০৮ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রপন্থা এবং ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। তাঁর সরকার হিজবুত তাহরিরসহ কয়েকটি ইসলামি উগ্রবাদী দলকে নিষিদ্ধ করেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়া এবং অন্যান্য স্থানে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। এ মর্মে তার সরকার প্রতিবেশি দেশ সহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে সন্ত্রাস নির্মূলে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। শেখ হাসিনার সরকারের উপর চাপ ছিল ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাবার। কিন্তু দেশের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে তিনি সম্পূর্ণভাবে ১৯৭২-এর সংবিধানে ফিরে যেতে পারেননি। তিনি ২০১১ সালের ৩ জুলাই সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্ম এবং সেকুলার মতাদর্শের মধ্যে একটি আপস রফা করে দেশে স্থিতিশীলতা আনার চেষ্টা করেছেন। এই সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

> The state religion of the Republic is Islam, but the state shall ensure equal status and equal rights in the practice of the Hindu, Buddhist, Christian and other religions. (Bangladesh Constitution, Article12)

সংবিধানের এরূপ সংশোধনীর মাধ্যমে সমাধান দেয়া হয়েছে তা কি সকল পক্ষ মেনে নিয়েছে? মনে হয় না। নাগরিক সমাজ ও বুদ্ধিজীবী সমাজ এতে আপত্তি জানিয়েছে, অমুসলিমরা ভীষণভাবে এতে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। অন্যদিকে হেফাজতে ইসলাম তাদের ১৩ দফা দাবি নিয়ে মাঠে রয়েছে। তা হলে এটা বলা সংগত যে, 'সেকুলারিজম' কেন্দ্রিক যে সমস্যা তার নিরসন হয়নি, সাময়িক উপশম হয়েছে হয়তো। তাই এটা অমীমাংসিতই রয়ে গেল। সুতরাং সংকট কেটেছে এটা বলা যাবে না। এ অবস্থার যে ব্যত্যয় হবে না সে কথা কেউ বলতে পারে না। এর উদাহরণ হলো সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে 'হেফাজতে ইসলাম' নামক সংগঠনের উদ্ভব। তাদের ১৩ দফা দাবির অন্যতম হলো ধর্মভিত্তিক সমাজ কায়েম। সুতরাং বাংলাদেশের সংকট কিন্তু রয়েই গেল। আর তা হচ্ছে অমীমাংসিত সেকুলারিজম। বাংলাদেশে এ সংকটের মূল কারণ হলো পুরাতন ধর্মীয় মূল্যবোধ। তবে আশার বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের জনগণ ধর্মপ্রাণ হলেও ধর্মান্ধ নন। পরিপূর্ণ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং পরিপূর্ণ ধর্ম-বিবর্জিত রাজনীতি এর কোনটাই এখানে ফলপ্রসূ নয়।

টীকা

১. 'সেকুলারিজম' (Secularism) বলতে শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাকে বুঝায় না। বরং সেকুলারিজম বলতে অঞ্চল, বর্ণ, শ্রেণি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় প্রভৃতি সংকীর্ণ চেতনার প্রভাব হতে মুক্ত থাকাকে বুঝায়। উন্নয়নশীল দেশে 'সেকুলারিজম' কিছুটা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে সেকুলারিজমকে ধর্মীয় প্রভাব মুক্ততা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর বাংলাদেশের সংবিধানে শুধুমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থেই সেকুলারিজমকে গ্রহণ করা হয়েছে। বহুল প্রচলনের কারণে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে সেকুলারিজম শব্দটি ব্যবহার করছি।

গ্রন্থপঞ্জি

Allana G. (1977). *Pakistan Movement : Historical Documents,* Karachic : Paradise Subscription Agency.

Bangladesh Constitution, Article 12, 2011.

Binder & Leonard (1963). *Religion and Politics in Paktistan*, Los Angeles.

Jahan, Rounaq (1980). *Bangladesh politics: Problems and Issues*, Dhaka.

— (1995). *Pakistan: Failure in National Integration,* Reprint, Dhaka, UPL.

Riaz, Ali (2008). *Islamist Militancy in Bangladesh*, Routledge.

প্রবন্ধপঞ্জি

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির (২০১০)। 'ধর্ম ও রাজনীতি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ', প্রবন্ধ সংকলন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রশীদ, মো. আবদুর, (১৯৮২)। 'ধর্ম ও রাজনীতি: পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ' সমাজ নিরীক্ষণ।

Moniruzzaman, Talukder (1985). *Bangladesh Politics: Secular and Islamic Trends*, South Asian Studies Series 12, New Delhi.

Rahman, Mohamad Sajjadur (2010). "Islamism in Bangladesh", *Journal of International Relations*, Vol: 8, No. 1.

Rashid, Harun-or- (2012). 'Desecularisation and the Rise of Political Islam in Bangladesh', *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* (Humanities), Vol. 57, No: 1.